অতিমারীতে কুমোরটুলি

(সেপ্টেম্বর, ২০২১)

দেবাশিস বিশ্বাস

গত বছর থেকেই বিশ্বজুড়ে মহামারি। ত্রাস হয়ে উঠেছে করোনাভাইরাস। ধ্বসে পড়েছে অর্থনীতি। এই পরিস্থিতির আঁচ স্বভাবতই এসে পড়েছে বাঙালির মহোৎসবে দুর্গা পুজায়। তার ধাক্কা লেগেছে কুমোরটুলির প্রতিমা শিল্পীদের ঘরে ঘরে। শিল্পীদের হতাশ মুখগুলো তাদের দুরাবস্থার সেই সংকেত দিচ্ছে। পুজোর বাজারের আঁচ সাধারণত বোঝা যায় মার্চ মাস থেকে। মার্চের শেষে হয় বাসন্তী পুজো। মার্চ থেকে এপ্রিল মাস শীতলা পুজোর মরসুম। এপ্রিলে অন্নপূর্ণা, জুনে মনসা। টুকটাক কালী পুজো তো লেগেই থাকে। বড় মরসুম আসার আগে, এগুলোও একটা আয় দেয় কুমোরটুলিকে। সাধারনত বাসন্তী আর অন্নপূর্ণা পুজোর পরেই শিল্পীরা হাত লাগান দুর্গা প্রতিমা তৈরিতে। কিন্তু পর্যাপ্ত বিক্রি না হওয়ায় এবছর এখনও কুমোরটুলির ঘরে ঘরে পড়ে রয়েছে অবিক্রিত বাসন্তী, অন্নপূর্ণা, গণেশের মূর্তি। গত বছর থেকেই এই সর্বনাশা পরিস্থিতি দেখে আসছে পটুয়া পাড়া। বুঝতে পেরে গেছে এবছরও প্রাক করোনাকালীন বায়না আসছে না। তবুও তো এবছর ছিল গণেশ পুজোর এক ঢেউ। পটুয়া ঘরগুলোতে এবছর কিছুটা হলেও অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে সিদ্ধিদাতা।

কলকাতার প্রাচীনতম রাজপথ চিতপুর রোড থেকে কুমোরটুলিতে ঢোকার মুখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। সময়টা সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি। পুজোর আর মাসখানেকও বাকি নেই। অন্যান্য বছর এ সময় কুমারটুলির অলিতে গলিতে ঢোকার সারা রাস্তা জুড়ে থাকে শয়ে শয়ে প্রতিমা। স্টুডিয়োগুলো সব ঘেঁষাঘেষি করে দাঁড়ানো। ফাঁকে ফাঁকে সরু-অতিসরু গলি-গলতা। প্রত্যেক বছর এ সময়টা এই এলাকা একেবারে গমগম করতে থাকে। পুজো কমিটির লোকজন, মাটি-কাঠ-বাঁশ-খড়ের জোগানদার, দক্ষ-অদক্ষ কারিগর নিয়ে ভিড়ে ঠাসা থাকে স্টুডিয়ো থেকে রাস্তাঘাট। রাস্তার দখল নিয়ে সার দিয়ে দাঁড় করানো থাকে কাঠামো। আর এখন? গত বছর গোটা এলাকা জুড়ে ছিল ভয়ঙ্কর এক শূন্যতা, তবে এবছর কিছুটা সাড়া রয়েছে এটাই আশার।

গত বছর থেকে পরিস্থিতি যে অনেকটাই ভালো, জানাচ্ছেন কুমারটুলির বিভিন্ন প্রতিমা শিল্পী। গতবছর যেমন মে জুন মাস অব্দি কোন বায়নাই প্রায় এসে পৌঁছয় নি কুমোরটুলির ঘরে, এবছর পরিস্থিতিটা তার থেকে অনেকটাই আশাজনক। তবে তা কখনোই করোনা পরিস্থিতির আগের সময়ের মতন নয়। সে সময়ের ব্যস্ততা এখন কোথায়! কুমারটুলির প্রতিটা ঘরে ঘরে এখন একই ছবি। বেশকিছু বায়না হয়তো এসেছে কিন্তু পরিস্থিতি খারাপের দিকে গেলে সেসব পুজো কমিটি যে শর্ত অনুযায়ী পুরো টাকা দিয়ে প্রতিমা ঘরে নিয়ে যাবেন, তার গ্যারান্টি কিন্তু নেই। এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন এখানকার প্রতিটি শিল্পী। কারণ তারা ইতিমধ্যেই বায়না অনুযায়ী প্রতিমা গড়তে শুরু করে দিয়েছেন। এদিকে প্রতিমা গড়ার উপকরণ বাবদ খরচ প্রতিবছর নিয়মমতো বেড়েই চলেছে, কিন্তু প্রতিমার দাম সেই পুরনো হিসাবে পাওয়া এখন স্বপ্নেরও অতীত। এই অনিশ্চয়তা থেকে সুরাহা মিলতে পুজো কমিটির কাছে কুমোরটুলি মৃৎশিল্পী সংগঠনের আবেদন, বরাতের সময় ৫০ শতাংশ জমা করুন। এতে শেষ অব্দি প্রতিমা কোন কারণে বিক্রি না হলে শিল্পীর আর্থিক ক্ষতি কিছুটা অন্তত কম হবে।

এক বর্ষীয়ান শিল্পী জানালেন, ২০২০তে যে পরিস্থিতি ছিল, এ বছর সেই তুলনায় অনেকটাই ভালো। গত বছর খুব বাজে অবস্থা ছিল, বায়না এসেছিল অনেক দেরিতে। প্রতিমার বাজেটও ছিল অনেক কম।

এবার পরিস্থিতি একটু ভালো, পুজোর বায়না আর প্রতিমার সংখ্যা বেড়েছে, যদিও সবার মধ্যে একটা চাপা টেনশন রয়েছে। রাজ্য সরকার সমস্ত পুজো কমিটিকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করছে। আবার শুনছি পুজো কমিটি গুলোর জন্য বিদ্যুতের বিল মুকুব করা হবে। পাশাপাশি গতবারের থেকে পুজো কমিটিগুলোর আর্থিক স্বচ্ছলতাও বেড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ঠাকুরের বায়না এসেছে গতবার থেকে অনেকটাই বেশি। শিল্পীরা যোগ্যতানুযায়ী দাম পাচ্ছে, তবে একেবারে বলব না যে তারা খুব ভালো দাম পেয়েছে। তবে এই পরিস্থিতির বিচারে তারা যা পেয়েছে ঠিকই আছে। গত বছর থেকে সেটা অনেকটাই বেশি। গতবছর করোনার আতঙ্কে একদম কিছুই ছিল না। এবছর করোনার ভয় যে নেই, তা বলব না। কিন্তু মানুষ সেই ভয় থেকে অনেকটা বেরিয়ে আসতে পেরেছে। সবচেয়ে বড় কথা, পরিস্থিতির জন্য পুজোর জাঁকজমক হয়ত কমে গেছে, বাজেট কমে গেছে, কলকাতার পুজোসংখ্যা কিন্তু কমেনি। এই মুহূর্তে যথেষ্ট বায়না এসে গেছে, শিল্পীরা আর নতুন করে বায়না হয়ত নেবে না। কারণ এখন বায়না নিলে এই অল্প সময়ে মূর্তি আর ফিনিশ করতে পারবে না। এতদিনে তো মাটি পড়ে গেছে, এবার মাটি শোকাবার যতটা সময় লাগে। তারপর রং এর পালা। এটা তো অনেক সময়ের ব্যাপার। কারিগররা চাইলেই দুদিনের মধ্যে তো প্রতিমা করে দিতে পারবে না।

গত ২০১৯ সালে বেশ জমজমাট ছিল কুমারটুলির বাজার। সেবছর প্রায় সাড়ে তিন হাজারের মতো দুর্গাপ্রতিমা গড়েছিল কুমোরটুলি। বিদেশে পাঠিয়েছিল প্রায় ষাটটি ফাইবারের মূর্তি। এখানে প্রতি বছর কালীঠাকুর তৈরি হয় প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার। এ ছাড়া বিশ্বকর্মা, লক্ষ্মী, জগদ্ধাত্রী, কার্তিক আসে একের পর এক পুজো। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর এই কয়েকটা মাস জুড়েই তো কুমারটুলির আসল ব্যবসা। যাকে বল্কেপিক সিজন্থ। আর এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি টাকার মুখ দেখায় দুর্গাপুজো।

কুমোরটুলিতে মূর্তি গড়ার কাজ করেন প্রায় সাড়ে তিনশ ঘর। পয়লা বৈশাখের মধ্যে শিল্পীরা একপ্রস্থ বুঝে যান এ বছর পুজোয় ক টা প্রতিমা গড়তে হচ্ছে। আষাঢ় মাসে রথের দিন ছবিটা পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে যায়। এখানে যেমন আবাসিক কারিগররা রয়েছে, তেমনই রয়েছে নবদ্বীপ নদীয়া মুর্শিদাবাদ - সে দিক থেকে আসা কারিগররাও। কিন্তু করোনার ভয়ে তাদের সংখ্যাটা এখন অনেকটাই কম। কলকাতায় এসে কাজ করতে তাদের বাড়ি থেকে আপত্তি। গ্রামের দিকের পরিবার গুলোর ধারণা, কলকাতায় যেহেতু প্রচুর লোক, এখানকার করোনা পরিস্থিতি খুব খারাপ। সুতরাং কলকাতা যাওয়া যাবে না। আমরা যেমন এই পরিস্থিতিতে পরিবারের সদস্য কাউকে ঘর থেকে দূরে যেতে মানা করছি, সেই একই আশঙ্কা থেকে বাইরের কারিগররা কিন্তু এখনও সেই ভাবে এখানে এসে কাজ করছে না।

সেসব কারিগর এখন তাদের এলাকাতেই ছোটখাটো কাজ কিংবা টুকটাক ঠাকুর বানিয়ে বিক্রি করছে। এই কারণেই দক্ষ এবং অদক্ষ শ্রমিক বাইরে থেকে কম আসছে।

প্রায় হাজার বছর বা তারও কিছু বেশি কাল আগে থেকে বাংলায় দুর্গাপুজোর কথা জানা যায়। সতেরো শতকে তাহেরপুরের রাজা কংস নারায়ন বাংলায় প্রথম বর্তমান আঙ্গিকের দুর্গাপুজো শুরু করেন। পরে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে দুর্গা পূজার প্রচলন শুরু করেন। সেই দুর্গা মূর্তি অনেকটা রাজপুতানা ঘরানার। ১৭৫৭ সালে, পলাশীর যুদ্ধের পরে, রাজা নবকৃষ্ণ দেবের শারদীয় দুর্গাপুজো থেকেই কলকাতার বর্তমান দুর্গোৎসব এবং কুমোরটুলির প্রতিমাশিল্পের উন্মেষ। রাজা কৃষ্ণনগর থেকে শিল্পী আনিয়েছিলেন। তার দেখাদেখি কলকাতা ও আশেপাশে দুর্গাপুজো বাড়তে থাকে। কৃষ্ণনগর থেকে চলে আসা সেইসব শিল্পীদের স্থায়ী পাড়া হয়ে ওঠে কুমোরটুলি। এখনও সেই দুর্গাপুজোতেই এই পাড়ার খাটাখাটনি-ব্যস্ততা বেশি, ব্যবসাও বেশি।

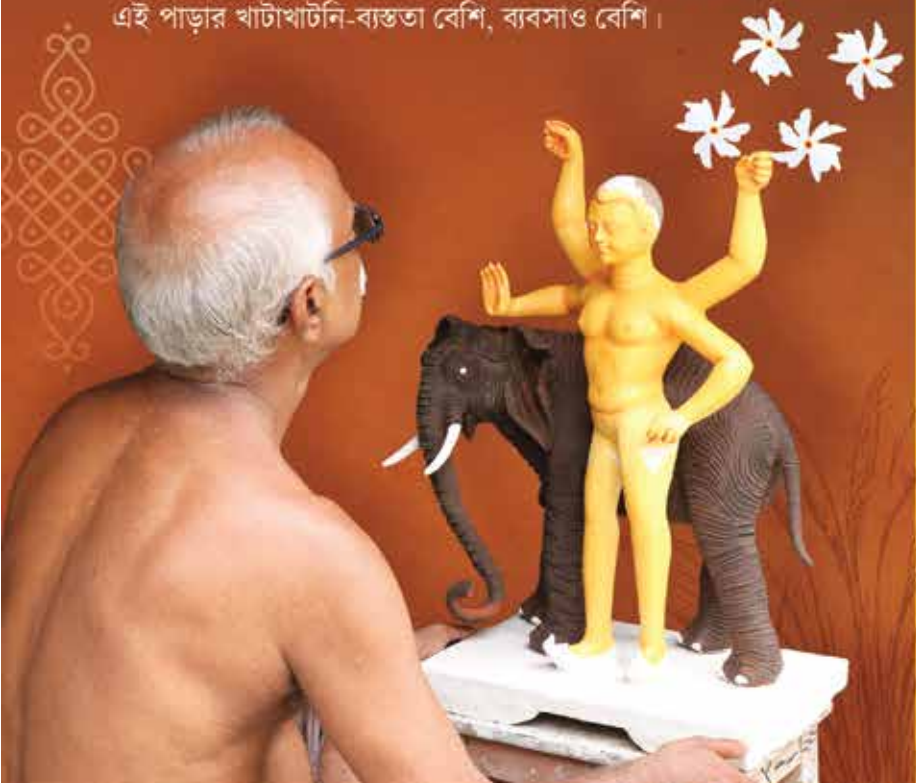

কুমোরটুলির প্রতিমা শিল্প শুধুমাত্র প্রতিমা শিল্পীদেরই বাঁচিয়ে রাখছে না, এর সঙ্গে রয়েছে অনেক ছোটখাটো অনুসারী শিল্প। একটা প্রতিমা তৈরিতে কুলি, ঠেলা, ভ্যান, লরি, মাটি-কাঠ-বাঁশ-খড়-পেরেক-দড়ির যোগানদার সবার কিছু-না-কিছু যোগদান রয়েছে। তারাও কিন্তু বেঁচে রয়েছে এই শিল্পটার উপর।

২০২০ সাল থেকে ভাইরাসের উপদ্রবে লন্ডভন্ড ইউরোপ-আমেরিকাসহ সমগ্র পৃথিবী। ফলত প্রতিবছর বিদেশ থেকে মূর্তির যে বায়না আসে গত বছর থেকে সেসব প্রায় বন্ধ। কিন্তু কাজ বন্ধ করে রাখলে তো চলবে না। সংসার রয়েছে। আর হঠাৎ করে কোন বায়না এসে গেলে যেটুকুনি আমদানির পথ খোলা থাকবে, মূর্তি তৈরী না করলে সেটাও হয়ে যাবে বন্ধ। তাই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে প্রতিনিয়ত বানিয়ে রাখতে হচ্ছে বিভিন্ন রকম মূর্তি।

মাপ অনুযায়ী প্রতিমার বিভিন্ন দাম। আট থেকে নয় ফুটের প্রতিমার সেট (লক্ষ্মী-সরস্বতী-কার্তিক-গণেশ সহ) আগে বিক্রি হত লাখখানেক টাকায়। ১২ ফুটের দাম দেড় থেকে দু লাখ। বিদেশে পাঠানোর জন্য ফুট পাঁচেকের যে ফাইবারের প্রতিমা তৈরি করা হয়, তার দাম হত এক থেকে দেড় লাখের মধ্যে। মোটামুটি যা হিসেব, তাতে সব মিলিয়ে গত ২০১৯ সালে শুধু দুর্গাপ্রতিমাই বিক্রি হয়েছে ৪০ কোটি টাকার বেশি। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে কমেছে পুজোর বাজেট, সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কমেছে বরাত। একচালা পুজোর দিকে ঝুঁকছে বেশিরভাগ পুজোকমিটি।

অন্যান্য বছর এ সময় দুর্গা মূর্তিতে মাটি পড়ে অনেকটা কাজ এগিয়ে থাকে। কিন্তু এখনও দেখা যাচ্ছে বহু জায়গায় বাঁশের কাঠামোর উপর সবে খড় বাধতে শুরু করেছে। কোনও জায়গায় ফুটিফাটা চেহারার দুর্গার কাঠামো। তার মধ্যেই রয়েছে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করা। গতবার আম্ফান যেমন বিভিন্ন বাড়ির চাল উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেভাবেই কুমোরটুলির অনেক শিল্পীর মাথার ছাদ উড়ে গিয়েছিল আম্ফানে। একই পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছে এবছর ইয়াসে। তার উপর রয়েছে একটানা অতিবৃষ্টি। তবে হাল ছাড়ছে না শিল্পীরা। কেউ কেউ এই বিপদকে এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছেন। তাদের বক্তব্য, হাল ছাড়লে তো চলবে না। এই পরিস্থিতিতেও কিভাবে কম পয়সায় প্রতিমা বানানো যায় সে দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তাদের কথাও। তারাও তো বাধ্য হচ্ছে তাদের পুজোর বাজেট কাটছাঁট করতে। স্বভাবতই তার ছাপ এসে পড়ছে প্রতিমার উপরেও।

ঠিক গত বছরের মতন উদ্যোক্তারাও সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন পুজো করতেই হবে। তবে যেহেতু সর্বক্ষেত্রে অর্থনৈতিক মন্দা, স্পনসরের অনিশ্চয়তা রয়েছে। পুজোর বাজেটে নিশ্চিতভাবেই কাটছাট। করোনা অতিমারীর আগের বছরগুলোয় কলকাতার পুজো ধাপে ধাপে এক চরম উৎকর্ষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। করোনার থাবা এক ঝটকায় তাকে মাটিতে নামিয়ে দিয়েছে। গত বছর প্রথমে তো কেউ ভাবতে পারেনিপুজো আদৌ করতে পারবে বলে। অবশেষে প্রশাসন এবং অন্যান্যদের সহযোগিতায় পুজো করা গেল ঠিকই কিন্তু আড়ে-বহরে অনেকটাই ছোট করে। এবছর এখনও পর্যন্ত সমস্ত পুজো কমিটি ঠিক করে রেখেছে পুজোটা অবশ্যই করবে, তবে সাধ্য অনুযায়ী। পুজো নিয়ে সবার সাধ তো অনেক, কিন্তু সাধে লাগাম পরাতে হয়েছে গত বছর থেকেই। সবাই ভাবছে পুজো করতেই হবে, তবে ছোট করে। এবং তাদের বক্তব্য, এই পরিস্থিতিতে সব পুজো ছোট করাটাই উচিত। যে কোন পরিবারে অর্থনৈতিক সংকট আসলে, সবাই নিশ্চয় খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে অনাহারে থাকে না। সেই সংকট সামাল দেবার জন্য প্রথমে কোপ পড়ে বিলাসিতার উপর। সংসার থেকে বিলাসিতাগুলোকে সাধ্য অনুযায়ী কাটছাঁট করে নেওয়া হয়। গত বছর পুজোর ক্ষেত্রেও সেই মতন জাঁকজমক কমেছে, এবছরও তার অন্যথা হবে না।

বারোয়ারি পুজো তো সর্বসাধারণের। সবাইকে নিয়ে মিলনেই পুজোর মাধুর্য। সেখানে জনসাধারণই যদি মরণ বাঁচন সমস্যার মধ্যে থাকে তাহলে মায়ের পুজোয় অত আড়ম্বরের সার্থকতা কথায়? সেসব ভেবেই অতিরিক্ত জাঁকজমক কমিয়ে ছোট করে পুজো করার কথা ভেবে ফেলেছে শহরের প্রায় সমস্ত নামী অনামী পুজো উদ্যোক্তারা। উৎসব তো মানুষকে মানুষের কাছে টানার জন্য। অথচ আজ প্রশাসন প্রতিনিয়ত বলছে মানুষকে বাড়িতে থাকতে। বলা হচ্ছে প্রতিমুহূর্তে দূরত্ব বিধি মেনে চলার কথা। সেজন্য উদ্যোক্তাদের কাছেও একটা বড় চ্যালেঞ্জ পুজোটা করার পাশাপাশি প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে পুজো দেখার ভিড়ে দূরত্ব বিধি খেয়াল রাখা। তাই বড় জমায়েত এড়াতে ছোট করে পুজোর আয়োজন। প্যান্ডেলে স্যানিটাইজিং ও থার্মাল গানের ব্যবস্থা, একসাথে সর্বাধিক ৫০ জন দর্শনার্থীর প্রবেশ।

কলকাতার পুজো এখন আর শুধুমাত্র সামান্য পুজো নেই। থিমের জাঁকজমকে কলকাতার পুজো হয়ে উঠেছে শিল্পের এক উন্মুক্ত প্রদর্শনীশালা। অনেক শিল্পীর মতে শুধু যদি ধর্মীয় বাতাবরণে থেকে এই দুর্গাপুজোকে দেখা হতো, তাহলে করোনা কালে পুজো বন্ধ করে রাখাটাই যথার্থ হতো। কিন্তু বর্তমানে কলকাতার পুজো যেহেতু আর শুধু ধর্মীয় আকারেই নেই, তা অনেক বড় আকারে শিল্পের পর্যায়ে চলে গেছে, ফলে গত বেশ কয়েক বছর ধরে এটা একটা ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে বললেও অত্যুক্তি হয় না।

তাই পরিস্থিতি যদি অস্বাভাবিক খারাপ না হয়, যেমন এখন করোনা যেমন কিছুটা বশে, ওই বিভিন্ন প্রান্তিক মানুষ - যারা এই ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে জড়িত, কিছুটা বেশি রোজগারের আশায় যারা এই চার-পাঁচটা দিনের দিকে তাকিয়ে থাকেন, তাদের কথা ভেবেও বিভিন্ন পুজো উদ্যোক্তাদের পুজোটা যতটা সম্ভব করার চেষ্টা রাখাটা উচিত হবে। এবং তাদের সাহায্য করার জন্য যতটা সম্ভব চেষ্টা করা উচিত প্রশাসনের লেভেলেও।

তবে করোনাভাইরাস যেমন আমাদের মধ্যের পারস্পরিক দূরত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে, মায়ের ক্ষেত্রে হয়েছে ঠিক উল্টোটা। বেশিরভাগ দুর্গা ঠাকুর এখন এক চালায়। করোনা ভাইরাসের প্রকোপে মা তার পরিবারের সাথে এখন অনেক কাছাকাছি। এই গোছানো দুর্গতিনাশিনীর কাছে এখন আমাদের প্রার্থনা - আমাদেরও আগের মতন মিলতে দাও মা। মাগো তোমার সন্তানেরা এই বিজয়ায় যেন একে অপরকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারে। দেবী দুর্গার কাছে এখন সবার একটাই কামনা - করোনার নাশ।